gvbbxq cavbgšx evsjv‡`‡ki cwiYwZ †Kb AvdMwwb vb

গোলাম মোর্তোজা, সাজেদুর রহমান ও অনিরুদ্ধ ইসলাম

■ বাংলাদেশে চলমান দানবীয় জঙ্গি তৎপরতার নায়ক বাংলা ভাই এবং শায়খ আবদুর রহমান। এটা জোট সরকারের এখনকার বক্তব্য। এ দুই জঙ্গিকে গ্রেপ্তারের জন্য সরকার এক কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

■ 'বাংলা ভাই এবং শায়খ আবদুর রহমানরা মহৎ কাজ করছে'- বলেছেন চারদলীয় জোট নেতা মাওলানা মহিউদ্দিন। মহৎ কাজ যারা করছেন তাদের গ্রেপ্তার করা হবে কেন? কেনই বা এক কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হবে?

প্রশ্নের ব্যাখ্যার আগে আরেকটু পেছনে ফিরে যাই।

বাংলা ভাই নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব হলো রাজশাহীর বাগমারা এলাকায়। গঠন করলো জেএমবি। শুরু করলো নারকীয় হত্যাকান্ড। বাংলা ভাই পত্রিকায়, টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিল। ক্যাডার বাহিনী নিয়ে রাজশাহীর এসপি মাসুদ মিয়ার সঙ্গে মিটিং করলো। পুলিশি পাহারায় আতঙ্ক ছড়িয়ে মিছিল করলো রাজশাহী শহরে। সেসব ছবি ছাপা হলো পত্রিকার পাতায়।

জোট সরকারের মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী, এমপি মুফতি ফজলুল হক আমিনী বলল, বাংলা ভাই বলে কেউ নেই- এটা মিডিয়ার সৃষ্টি। চারদলীয় জোটের আরো অনেক মন্ত্রী, নেতা বললেন একই কথা।

তারপর অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। যার সবই পাঠকের জানা। পুরনো তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত করতে চাইছি না।

ঘটনাগুলো উল্লেখ করলাম এ কারণে যে, খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে যে জঙ্গিরা বেড়ে উঠেছে, সেটা প্রমাণ করার জন্য আর কিছু লেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বলা হয়, জোটের একটি অংশ জঙ্গিদের আশ্রয়-প্রশয় দেয়। বোঝানো হয় জামায়াত এবং ইসলামী ঐক্যজোটকে। এ অংশটি জঙ্গিদের প্রধান শেল্টারদাতা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রতিমন্ত্রী দুলুদের বিষয়টিও ভুলে গেলে চলবে না। সুতরাং বাংলাদেশে জঙ্গিদের যে উত্থান ঘটলো তার দায় সমগ্র জোট সরকারের। ঝালকাঠিতে বিচারক হত্যার পর দুমড়ানো-মোচড়ানো যে গাড়ির ছবি পত্রিকায় ছাপা হয় তার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে ইরাক বা আফগানিস্তানের বোমা বিস্ফোরণের। বাংলাদেশের জঙ্গি তৎপরতার দায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নিতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকেই জবাব দিতে হবে বাংলাদেশের পরিণতি কেন আফগানিস্তান হতে যাচ্ছে।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার বছরখানেকের মধ্যে পশ্চিমের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গি তৎপরতা সম্পর্কে রিপোর্ট করতে গিয়ে এ আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছিল, বাংলাদেশ আরেকটি আফগানিস্তান হচ্ছে কি না? ওই সব রিপোর্টে বাংলাদেশে আফগানিস্তান থেকে মুসলিম নামের এসব জঙ্গির আগমন, তাদের অস্ত্র সরবরাহের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের সংবাদপত্রসমূহে আফগানিস্তান থেকে ফিরে আসা মুজাহিদদের বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে জঙ্গি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার খবরও বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়। কিন্তু সরকার ও একশ্রেণীর কলাম লেখকরা এসব প্রতিবেদনকে বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা বলে আখ্যায়িত করেন।

তবে এখন আর সাংবাদিকরা নন, সরকারের গোয়েন্দা বিভাগই বলছে, বাংলাদেশে জামাআতুল মুজাহিদিন, হরকাতুল জিহাদ এবং অন্যান্য নামে যে জঙ্গি তৎপরতা চলছে তার সঙ্গে আফগানিস্তানে তালেবানদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ওই সব জঙ্গি কেবল জড়িতই নয়, তারাই অগ্রবর্তী ভূমিকা নিয়ে এসব জঙ্গি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। আওয়ামী লীগ শাসনামলে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় প্রধানমন্ত্রীর জনসভাস্থলে ৭০ কেজি ওজনের বোমা পুঁতে রাখার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদন্ডপ্রাপ্ত মুফতি হান্নান আফগানিস্তানে তালেবানদের সঙ্গে শুধু ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিতই ছিল না, ওসামা বীন লাদেনেরও ঘনিষ্ঠ সাহচর্য

পেয়েছে। সে সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে আফগানিস্তানে যুদ্ধ করার জন্য শুধু যোদ্ধা রিক্রুটই করা হয়নি, এ দেশের ইসলামপন্থি বিভিন্ন দলের নেতাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তালেবান শাসনের প্রকৃত অবস্থা বোঝার জন্য। তারা দেশে ফিরে এসে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে বই লিখেছে এবং বিনামূল্যে সেসব বই প্রচার করা হয়েছে। আফগানিস্তানে মুজাহিদিনের যুদ্ধ এবং ট্রেনিংই কেবল নয়, কাশ্মীরের বিভিন্ন জঙ্গি ক্যাম্পের ট্রেনিং সংক্রান্ত ক্যাসেটও এখানে কপি করে বিলি করা হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানানোর প্রত্যয়ও ব্যক্ত করা হয়েছে এসব ইসলামী সংগঠন থেকে। বিভিন্ন মাদ্রাসা-মসজিদে জুমার নামাজের খুতবায়, ইসলামী ধর্মসভাগুলোয় জেহাদের সপক্ষে প্রচার চলেছে। সর্বশেষ ইসলামী জঙ্গি সংগঠনগুলোর সামরিক তৎপরতায় এখন স্পষ্ট যে, তারা কেবল মুখের কথাই বলেনি, বাস্তবেও বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানাতে চায়।

ইসলামী ঐক্যজোট নেতা শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হকের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম ১৯৯৭ সালে। সে দিন তিনি বলেছিলেন, ইসলামী শাসন কায়েমের জন্যে তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখন তার কথায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকার গুরুত্ব না দিলেও এখন তার প্রমাণ মিলছে। সে দিন তিনি বলেছিলেন, তালেবানরা তাদের আদর্শ।

বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানানোর ক্ষেত্রে যারা কাজ করছেন তাদের মধ্যে অন্যতম মাওলানা মহিউদ্দিন।

মাসিক মদীনা পত্রিকার সম্পাদক তিনি। তার মদীনা ভবনকে বলা হচ্ছে জঙ্গি তৎপরতার হেডকোয়ার্টার। এখান থেকেই পরিকল্পনা করা হচ্ছে বাংলাদেশে তালেবানি শাসন কায়েম করে আফগানিস্তান বানানোর।

মদীনা ভবনের জঙ্গি তৎপরতা বিষয়ে গোয়েন্দারা এখনো সতর্ক নয়। ঢাকা শহরে ইসলামী বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি করার জন্য যাত্রাবাড়ী, গাবতলী, উত্তরা, গোড়ান, বাসাবোসহ ঢাকা শহরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মদীনা ভবনকে জঙ্গি হেডকোয়ার্টার হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। জানা যায়, ২০০৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মদীনা ভবনে চারদলীয় জোট নেতা মাওলানা মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে জঙ্গিদের একটি সভা হয়। এতে জেএমবি, হরকাতুল জিহাদ, হিজবুত তাহিরী, জমিয়ত-ই ইসলামসহ সর্বমোট ১৪টি ছোট-বড় জঙ্গি সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় সিদ্ধান্ত হয় কীভাবে ঢাকা শহরে জঙ্গিদের শক্তিশালী এবং হেডকোয়ার্টার হিসেবে মদীনা ভবনকে ব্যবহার করা যায়। কৌশল হিসেবে ঐ দিনই সিদ্ধান্ত হয়, গোয়েন্দাদের ফাঁকি দেয়ার জন্য টিপাই বাঁধ অভিমুখে ৯ ও ১০ মার্চ লংমার্চ হবে। বাহ্যিক দিক থেকে টিপাই বাঁধমুখী লংমার্চের কর্মসূচি দেখানো হলেও এটি ছিল ঢাকার জঙ্গিদের অবস্থান শক্তভাবে গেড়ে দেয়ার একটি মহড়া।

2005 mv‡ji 2 †de“qvwi g`xbv fe‡b gvIjvbv gwnDwÏ‡bi m‡½ niKvZj †Rnv` †bZv gdmZ nvbvb

প্রকাশ্যে লিফলেট বিতরণ, পোস্টার সাঁটা, লংমার্চ-পূর্ব সভা-সমাবেশ হলেও ভেতর দিক থেকে ছিল মোহাম্মদপুর, যাত্রাবাড়ী, উত্তরা, গোড়ান, বাসাবোয় জঙ্গিদের সংগঠিত করা এবং ঢাকা শহরে রাজনীতির সঙ্গে মিশে যাওয়ার কৌশল শেখানো।

৮ মার্চ লংমার্চের আগের দিন সন্ধ্যা থেকে সংহতি জানাতে মদীনা ভবনে আসে বোমাবাজ মুফতি হান্নান, জামায়াতের একটি প্রতিনিধিদল, এছাড়া তিনজন পীরের সন্তানও যোগ দেয় এই মিটিংয়ে।

পুলিশ সূত্র এখন বলছে, আফগানিস্তান ফেরত ২ হাজার জঙ্গি বাংলাদেশে এ অপতৎপরতার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। পুলিশ মুফতি হান্নানকে বারবার রিমান্ডে নিয়ে এ ব্যাপারে তথ্য জানতে চাচ্ছে। অন্য জঙ্গিদের গ্রেপ্তার করেও এ তথ্য জানতে পুলিশ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আফগান ফেরত জঙ্গিদের ওপর তালিকার ভিত্তিতে নজরদারি এবং তল্লাশির নির্দেশও দেয়া হয়েছে পুলিশ, র‍্যাব ও অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাকে। কিন্তু বাংলাদেশকে আফগানিস্তানে পরিণত করার চক্রান্তটি থেমে নেই। কারণ প্রশ্ন আছে সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে। সরকার যদি আন্তরিকভাবে জঙ্গিদের দমন করতে চাইতো তাহলে 'পুরস্কার ঘোষণা' এবং 'মহৎ কাজে'র মতো ঘটনা একই সঙ্গে চলতে পারতো না।

সরকারি তথ্যেই এখন প্রকাশ যে, পুলিশ অথবা গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানানোর এ ধরনের জঙ্গি তৎপরতার কথা জানতো না তা নয়, দেশী-বিদেশী সংবাদপত্রেও বিভিন্ন সময় এ ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। তাহলে এ ধরনের অপতৎপরতা সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি কেন? এর উত্তর গত দেড় দশকের রাজনীতি ও দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। নব্বইয়ের গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের সময়ই কার্যত বাংলাদেশে এই জঙ্গি তৎপরতা সাংগঠনিক রূপ নিতে থাকে। আর এ সময় দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বিএনপি ক্ষমতার প্রয়োজনেই জামায়াতে ইসলামীকে তার মিত্র হিসেবে বেছে নেয়। নতুন সরকার ক্ষমতায় জামায়াতকে অংশীদার না করলেও জাতীয় সংসদে আসন দিয়ে তাদের সঙ্গে মিত্রতার যে মেলবন্ধন গড়ে ওঠে তার ফলে জামায়াত-শিবির বিরোধী 'ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিএনপি সরকার চরম নিপীড়নমূলক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ সময় পল্টন ময়দানের জনসভায় ইসলামপন্থি বিভিন্ন দলের তরফ থেকে বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানানোর প্রকাশ্য স্লোগান দেয়া হয়। কিন্তু ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলন দমন করতে বিএনপি সরকার ঐ বিষয়ে নজর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। বরং বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানানোর রাজনৈতিক প্রচারকে সহায়তা করেছে।

বিরোধী দলে অবস্থানরত আওয়ামী লীগও এ সময় ক্ষমতার হিসাব-নিকাশ করে ইসলামপন্থি দলগুলোকে তাদের সঙ্গে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে এবং পার্লামেন্টে বিরোধিতার নামে কৌশলগত মিত্রতার স্লোগানে জামায়াতের সঙ্গে রাজনৈতিক মিত্রতা গড়ে তোলে। এ রাজনৈতিক পরিস্থিতির ছত্রছায়ায়ই নব্বইয়ের মাঝামাঝিতে বাংলাদেশে আফগান ফেরত এসব জঙ্গিদের কার্যক্রম বিস্তৃত হয় এবং আওয়ামী লীগ শাসনামলে এসে তারা তাদের সামরিক তৎপরতা শুরু করে। ক্ষমতান্ধ

আওয়ামী লীগ ইসলামী জঙ্গিদের এসব কার্যক্রমের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন না করে একে বিরোধী দল বিএনপির বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে ব্রতী হয়। এ কারণেই ইসলামী জঙ্গিরা উদীচীর বোমা হামলায় জড়িত থাকলেও পুলিশি তদন্তে বিএনপি নেতা তরিকুল ইসলামকে জড়িয়ে মামলার চার্জশিট দেয়া হয়। তবে ক্ষমতার শেষ ভাগে এসে আওয়ামী লীগ বিপদ বুঝতে পারলেও ততো দিনে পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে এবং এবার বিএনপি জামায়াতসহ ইসলামপন্থিদের নিয়ে চার দলের যে জোট গড়ে তোলে তাতে ইসলামী জঙ্গিদের এ তৎপরতা আড়াল পেয়ে যায়।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের ক্ষমতারোহণই ২০০১ সাল থেকে বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতার দ্রুত বিস্তার ঘটিয়েছে। ক্ষমতার অংশীদারিত্বের সুযোগ নিয়ে এসব সংগঠন যেমন রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে তাদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়, তেমনি তাদের তৎপরতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। প্রশাসনের একটি অংশ ইসলামী জঙ্গিদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে। সামরিক বাহিনীর সদস্যদের এ ধরনের তৎপরতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ ধরনের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক-সামরিক অবস্থায় বাংলাদেশ যদি আরেকটি আফগানিস্তানে পরিণত হয় তাহলে আশ্চর্যের কিছুই থাকবে না। বস্তুত বাংলাদেশ আফগানিস্তানের সেই পরিণতির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়। আর সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কেবল অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্যকর অবস্থায়ই পতিত হবে না, এ দেশে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাও তখন বাস্তব রূপ নেবে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ অকার্যকর রাষ্ট্রের তালিকায় আছে। ব্যর্থ রাষ্ট্রের সংজ্ঞায়ও তাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। আর এ ধরনের অকার্যকর ও ব্যর্থ রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার ব্যাপারে হুমকি বলে মনে করা হয়। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও আশ্চর্যের কিছু হবে না। শুনতে যত খারাপই লাগুক না কেন, এটাই এখন বাস্তবতা।

এই বাস্তবতা থেকে কীভাবে বের হয়ে আসা যায় সে বিষয়ে সরকারের কোনো উদ্যোগ নেই।

১৭ আগস্টের আগে এ সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৫ শতাধিক জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছিল। গ্রেপ্তারকৃতরা প্রায় সবাই বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে আসার কারণ হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সচিব বলেন, জঙ্গি অভিযোগে যারা আটক ছিল তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের প্রমাণ না পাওয়ায় ছাড়া পেয়েছে। বাংলা ভাই ২০০২-এর ১৭ আগস্ট বাগেরহাটের মোল্লাহাটে ১২ জঙ্গিসহ গ্রেপ্তার হয়েছিলো। দেখা গেল, দু'দিনের মাথায় ছাড়া পেয়ে যায়। অনুসন্ধানে জানা যায়, সে সময় বাগেরহাট থানা থেকে যে এজাহার দায়ের করা হয়, তাতে বাংলা ভাইয়ের নামই উল্লেখ করেনি। তাই আদালতে অভিযোগও ওঠেনি। ২০০৩ সালেও বাংলা ভাই জয়পুরহাটের জেলগেটে ২ সহযোগীসহ ধরা পড়েছিল। সেবারও ছাড়া পায় পুলিশের সুষ্ঠু তদন্তের অভাবে। ২০০৩-এর ১৫ আগস্ট

'জঙ্গি নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা জাতীয় সমস্যা'

অ্যাডভোকেট জয়নাল আবেদিন
বিএনপির আইনবিষয়ক সম্পাদক

সাপ্তাহিক ২০০০ : সমস্যা নিরসনে সরকার যা করছে তা যথেষ্ট কি না?

জয়নাল আবেদিন : এ সরকার গণতান্ত্রিক সরকার। গণতান্ত্রিক সরকারের যতগুলো পদক্ষেপ নেয়া উচিত তার সবগুলো নিয়েছে। এখানে সরকার প্রচলিত আইনের ব্যবহার করে পদক্ষেপ নিয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে সরকারের আন্তরিকতার অভাব নেই। অভাব যেটা আছে তা হলো, বিরোধী দলের সহযোগিতা। জঙ্গি সমস্যাকে তারা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছে। বুঝতে হবে, আজকে জঙ্গি নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে তা জাতীয় সমস্যা। সম্প্রতি ঝালকাঠিতে বিচারক হত্যার দায়ে মামুন নামের যে জঙ্গিকে ধরা হয়েছে, তাকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যখন প্রশ্ন করল, আপনিও তো মারা যেতে পারতেন। তখন মামুন বলল, হ্যাঁ আমি মারা যেতে পারতাম। মারা গেলে আমি শহীদ হয়ে যেতাম। মামুনের এ কথায় একটা বিষয় বেরিয়ে এসেছে তা হলো, ইসলামের নামে তার ব্রেন ওয়াশ করা হয়েছে। একটা সংঘবদ্ধ চক্র এ কাজ করছে। এ চক্রের উদ্দেশ্য ইসলাম কায়েম করা। ইসলাম এমন এক ধর্ম, যে ধর্ম মানুষ মারার কথা বলে না।

২০০০ : আমরা মূল বিষয়ের মধ্যেই থাকতে চাই। সরকার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়েছে কি না? বিশেষ করে আইনের দিকটা নিয়ে যদি বলতেন।

জয়নাল : সেখানেই আসছি। দেশে যদি নতুন আইনের প্রয়োজন হয়, তবে তা সংসদের মাধ্যমে আসবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমি বলতে চাই, জঙ্গিদের দমন প্রচলিত আইনেই করা সম্ভব। সরকার তাই করছে।

২০০০ : জঙ্গিদের ধরার ব্যাপারে প্রথম দিকে সরকারের অনীহা ছিল স্পষ্ট। সব মিডিয়ার সৃষ্টি এমন কথা বলেছে। দু-চারটা জঙ্গি যারা ধরা পড়তো, তারাও মুক্ত হতো অল্প দিনেই। এমনকি নিম্ন আদালতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা উচ্চ আদালত থেকে জামিনে মুক্ত হয়েছে। এ উদাহরণগুলো কি সরকারের নমনীয় নীতির বহিঃপ্রকাশ নয়?

জয়নাল : এগুলো কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা। উপযুক্ত সাক্ষী-প্রমাণ না পাওয়ায় এমনটি হয়েছে বলে আমার ধারণা। আদালতে তো তার সামনে যেসব তথ্য পান তার ভিত্তিতেই বিচার করেন। দেখা গেলো, যে ধারায় চার্জশিট হয়েছে, আদালতে তার পক্ষে জোরালো কোনো প্রমাণ না পাওয়ায় খালাস দিয়ে দিচ্ছেন। এখানে সরকারের উদাসীনতা কোথায়? ১৭ আগস্টের পর যেসব জঙ্গিকে ধরেছে, তাদের বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলাও হয়েছে। চার্জশিট দিচ্ছে। চার্জশিট দিলে তো বিচার শুরু হয়ে যাবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিচার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। আইনমন্ত্রী বলেছেন, অনেককেই দ্রুত বিচার আইনে বিচার করা হবে।

২০০০ : অনেককেই কেন, সব নয় কেন?

জয়নাল : চার্জশিটের ওপর ভিত্তি করেই নির্ণয় করা হবে, দ্রুত বিচার আইনে হবে কি না।

২০০০ : এখন পর্যন্ত ৩৫/৩৬টির চার্জশিট দিয়েছে, সেগুলোর মধ্যে কয়টি দ্রুত বিচার আইনের আওতায় পড়েছে?

জয়নাল : আমি ঠিক জানি না।

২০০০ : বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ বাসাবোয় ধরা পড়া জঙ্গিদের চার্জশিটটা দেখেছেন?

জয়নাল : না, পত্রিকায় পড়েছি।

২০০০ : সর্বোচ্চ শাস্তি কি হতে পারে?

জয়নাল : অস্ত্র আইনের ১৯ (এ)/১৯ (এফ) এবং বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৪ ও ৬ ধারায় চার্জশিট দেয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড হতে পারে। দ্রুত বিচার আইনে বিচার হতে পারে। আপনি দেখেছেন, দ্রুত বিচার আইনে অনেকের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হয়েছে।

আতাউর রহমান (আব্দুর রহমানের ছোট ভাই), রাসেলসহ (বাংলা ভাইয়ের দেহরক্ষী) ৪২ জনকে পুলিশ আটক করে। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযোগ, জয়পুরহাটের উত্তর মহেশপুরে জঙ্গিরা অতর্কিতে পুলিশের টহল দলের ওপর হামলা চালিয়ে ৩টি শটগান, ২২ রাউন্ড গুলি ও একটি বেতারযন্ত্র (ওয়াকিটকি) ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ৪২ জনই আদালত থেকে জামিন পায়। এমনকি আগের বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগে অভিযুক্ত দিনাজপুরের রাজারহাটের শাহাদাতকেও আটকে রাখা যায়নি। সেই মামলার শেষ খবর কি তা জানা যায়নি। তবে জয়পুরহাট জেলার দায়রা জজকোর্টে অনুসন্ধানে জানা গেছে, লুটপাটকৃত অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি। ৪২ জনের আরেকজন গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার বারকোনা গ্রামের আবদুল্লাহপাড়ার আনিসুর রহমানের কাছ থেকে বোনারপাড়া রেলস্টেশনে ২৪টি টাইম বোমা ও ১২৪টি ডেটেনেটর পুলিশ জব্দ করেছিল। আনিসুর ধরা পড়েছিল গত বছর ১২ নবেম্বর। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, পুলিশের জব্দ করার আলামত চরম অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গাইবান্ধার সদর থানায় আলামতের নামে যা আছে তা নিতান্ত অপ্রতুল। টাইম বোমা বলতে ৬টি টিনের কৌটা আর ডিটেনেটর বলতে যা আছে তা ইঁদুরে ঝাঁঝরা করা কতগুলো পোটলা। পুলিশের অবহেলা শুধু আলামত রক্ষণাবেক্ষণেই নয়, তদন্ত করার ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

২০০৩ সালের ২৫ এপ্রিল রাতে জয়পুরহাটের কালাই উপজেলায় গ্রেপ্তার করা জামাআতুল মুজাহিদিনের ৭ সদস্যকে ৫৪ ধারায় আটক দেখানো হয়। পরে পুলিশ মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিলে তারা বেকসুর খালাস পায়। এদের একজন সালাউদ্দিন ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে কালাই ব্র্যাক অফিসে বোমা হামলার ঘটনায় আবার ধরা পড়ে। জয়পুরহাটের সিআইডি কর্মকর্তা জানান, ৭ জনের মধ্যে ৫ জনের বিরুদ্ধে কালাইয়ের বেগুন গ্রামের পীরের আস্তানায় ৫ খুনের সুস্পষ্ট অভিযোগ ছিল। পুলিশ সে কারণেই গ্রেপ্তার করেছিল। দেখা গেলো পুলিশের ধরাই সার। কোনো প্রকার তদন্তে গেলো না। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে মাসুদ, রাজু ও সুজাউলের বিরুদ্ধে খুনের প্রমাণ ছিল। পুলিশের তদন্তের অভাবেই আদালতে কোনো প্রমাণাদি হাজির করা যায়নি। জঙ্গিদের ছাড়া পাওয়ার আরেকটি কারণ হিসেবে বলা যায়, সরকারের সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কথায় বিষয়টি বেরিয়ে এসেছে।

প্রশ্ন আসে, সরকার এই চক্রের মধ্যে পড়ে গেছে কেন? কারণ সবখানেই তো নিজের লোক। জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোটের ক্যাডাররাই তো জামাআতুল মুজাহিদিন, হরকাতুল জিহাদের সদস্য। এমনকি গাইবান্ধার ৭ জন জঙ্গি তো বিএনপিতেও যোগ দিয়েছে। সরকারের সূত্রগুলো জানায়, ৬৩ জেলায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পর নিষিদ্ধঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নেয়া শুরু করলে সরকারের শরিক একাধিক দলের মধ্য থেকে আপত্তি ওঠে। চার দলের মহাসচিবদের বৈঠকে বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট পুলিশের এই অভিযানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। শরিকদের চাপে রাজশাহী, নাটোরসহ বেশক'টি জেলা প্রশাসকের কাছে ফ্যাক্স পাঠায়। নাটোরের ফ্যাক্সবার্তায় বাংলা ভাইয়ের আশ্রয়দাতা প্রতিমন্ত্রী রহুল কুদ্দুস দুলু, আলমগীর কবিরের স্বাক্ষরসহ বলা হয়, জঙ্গি দমনের নামে নিরপরাধ কাউকে হয়রানি করা যাবে না। জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দফায় দফায় সংশ্লিষ্ট সব মহলের সঙ্গে বৈঠক করলেও স্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। জামাআতুল মুজাহিদিনের অপারেশন কমান্ডার ল্যান্স নায়েক (অবঃ) হারুনুর রশিদ, সংসদ সচিবালয়ের সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা বাবুল আনসারীর মতো কর্মকর্তারা জঙ্গি তৎপরতায় জড়িয়ে যাওয়ার পরও সরকার কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, ১৭ আগস্ট ৬৩টি জেলায় ৪৩৪টি স্থানে বোমা বিস্ফোরিত হয়। এ অভিযোগে গত ২১ আগস্ট পর্যন্ত ৩৮৯ জন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে। ৩৭টি মামলার চার্জশিট দিয়েছে। প্রথম চার্জশিট হয় ঢাকায় ৫ অক্টোবর। অস্ত্র আইন ১৯ (এ)/১৯ (এফ) চার্জশিট দেয়া হয়। ৭ অক্টোবর একই মামলায় বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৪ ও ৬ ধারায়। মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত তথ্য দিয়েই স্পষ্ট জানিয়ে দিল আর কিছু বলা যাবে না। চার্জশিটের কপি তো দূরের কথা, দেখতেও দেবে না। অন্যান্য সাধারণ মামলায় যত সহজে চার্জশিট পাওয়া যায়, জঙ্গিদের ব্যাপারে ঠিক ততটাই কঠিন। চার্জশিটের গোপনীয়তা রক্ষার্থে সরকার যারপরনাই লুকোছাপা করছে। ঢাকা, রাজশাহী, জয়পুরহাটে চার্জশিটের কপি একবার চোখে দেখার জন্য বহু চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েই ফিরছিলাম। শেষে যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা সত্ত্বেও কয়েকটি কপি দেখতে দেয়া হয়। দেখা যায়, বাসাবো এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ বোমা, বোমা বানানোর ৬১ প্রকার সরঞ্জামসহ তাদের আটক করে। দু'দিনের ব্যবধানে দুটি মামলা হয় অস্ত্র আইনে ও ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৪ ও ৬ ধারায়। দুটি মামলাতেই আসামির সংখ্যা ৬। সাক্ষী ১৩ জন। অস্ত্র মামলায় ১ জন আর বিস্ফোরক মামলায় ২ জন তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম দেখা যায়। বিস্ফোরক মামলায় এক জায়গায় লেখা '৩নং কলামে আসামিদের গ্রেপ্তার করিয়া বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হইয়াছে (ক্রমিক নং-২ ব্যতীত অন্যান্য আসামির নাম-ঠিকানা যাচাই করা সম্ভব হয় নাই। ২নং অভিযুক্ত হলো- মোঃ জাকারিয়া ওরফে জুয়েল (২১), পিতা মোঃ আজাহার হোসেন, সাং- দিনাজপুর, থানা- গোমস্তাপুর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বর্তমানে অতীশ দীপঙ্কর রোড, থানা- সবুজবাগ, ঢাকা।

সরকার পক্ষ থেকে যখন কোনো চার্জশিট দাখিলের প্রশ্ন ওঠে তখন সেই চার্জশিটের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ আদালতে মামলা চলার সময় তখন সরকার পক্ষের মুখ্য হাতিয়ার থাকে ঐ চার্জশিট। তাই চার্জশিটে যদি কোনো মৌলিক দুর্বলতা থাকে তাহলে বিবাদীর জেরার সামনে সরকার পক্ষের সব অভিযোগ তুলার মতো উড়ে যায়।

তদন্তকারী কর্মকর্তা মোঃ আবদুর রউফ মিয়া তদন্ত শেষে যে চার্জশিট দাখিল করেছেন তাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে প্রাপ্ত মোবাইল, কম্পিউটার, বই, প্রিন্টার, টাকা ইত্যাদি সব জিনিসের বিস্তর বিবরণ প্রদান করেছেন। চার্জশিটে এগুলো থাকতে হয় বলে তিনি যা করেছেন তা ঠিকই করেছেন। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে যে বোমা তৈরির সরঞ্জামও পাওয়া গেছে সেটা তিনি উল্লেখ করলেও এমন নিষিদ্ধ জিনিস রাখার জন্য কোনো সুস্পষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করেননি। নিয়ম হলো, অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত উপাদান ও সূত্রগুলোর চরিত্র বিশ্লেষণ করে চার্জশিটে উল্লেখ করা। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ উপাদানগুলো দন্ডবিধির কোন ধারা অনুসারে অপরাধ হিসেবে গণ্য তাও উল্লেখ করা। এবং কী কী উপাদান থাকলে সেটি অপরাধ তাও উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু হতাশাজনক ব্যাপার হলো, গুরুত্বপূর্ণ সবগুলো বিষয়ই এ চার্জশিটে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে এটি খুবই দুর্বল একটি চার্জশিট হয়েছে। আসামির ঘরে যে মালামাল পাওয়া গেছে তার কথা লেখা হয়েছে। কিন্তু তদন্ত করে চার্জশিটে বলা প্রয়োজন ছিল ঐ মালামাল আসামির। সেটা তদন্তে ও চার্জশিটে বিশেষভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এই মালামাল আসামিরই, আদালত তার প্রমাণ পাবে না। তখন ডাকা হবে চার্জশিটদাতা পুলিশ অফিসারকে। এবং তিনি বলবেন মালামাল আসামির ঘরে পাওয়া গেছে। এগুলো যে আসামির, আসামি যে এগুলো ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করতো তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এ রকম কাজ করা পুলিশের একটা নিয়মিত অভ্যাস। অনেক কষ্টে সংগ্রহ করা এই দুটি চার্জশিট থেকেও পাওয়া গেল একই প্রমাণ। আশা করা যায়, সারা দেশের সবগুলো চার্জশিটের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটেছে, ঘটছে, ঘটবে।

পুলিশ কী তদন্ত করছে, চার্জশিটে কী লিখলো এটা দেখার তাগিদ সরকার অনুভব

করছে না। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ভাঙা রেকর্ড বাজিয়ে যাচ্ছেন- নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে, জঙ্গি ধরা হচ্ছে, ৭ দিনের মধ্যে চার্জশিট দেয়া হবে...

দর্শক হয়ে দেশবাসী এই তামাশা দেখছে। এ ছাড়া তাদের আর কিছু করার নেই। দেখছেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াও। তার অনেক কিছু করার আছে। তিনি করছেন না কিছুই।

যৌথ জিজ্ঞাসাবাদ সেলের একজন সদস্য জানান, জঙ্গি যারা ধরা পড়েছে তাদের বেশির ভাগই গ্রামের বেকার, কৃষক, মাদ্রাসার ছাত্র ও অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল পরিবার। সমাজের এই শ্রেণীর লোকজনই জঙ্গিদের টার্গেট। আর এই টার্গেট নির্ধারণ করে সমন্বয়কারী। গোয়েন্দা সদস্যরা এই সমন্বয়কারীর একটা তালিকাও করেছে। দেখা গেছে, আব্দুর রহমানের ভাই আতিউর রহমান সমন্বয়কারী গ্রুপের প্রধান।

আতিউর রহমানের অধীনে দুই থেকে আড়াইশ সমন্বয়কারী। এদের কাজ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মানুষ একত্রিত করা। এই দলে আর যেসব জঙ্গির নাম পাওয়া যায় তারা হলো- ১. দিনাজপুরের জামায়াত নেতা আবুল কাশেমের ছেলে মিজানুর রহমান, ২. দিনাজপুরের জামায়াত নেতা আলহাজ আবুল কাশেম।

জঙ্গিদের একত্রিত করার পর শুরু হয় ব্রেন ওয়াশের কাজ। প্রাথমিক পর্যায়ে মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য প্রথমেই ধর্মের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা বলে। সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের প্রতি নির্যাতনের চিত্রও তুলে ধরে। অর্থনৈতিক সুবিধার কথা বলতে গিয়ে তারা বলে, থাকা-খাওয়া ফ্রি। ভালো কাজ করতে পারলে অনেক অর্থ প্রাপ্তি হবে, এমনকি বিদেশ গমনের সুযোগ হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিডিয়া পরিচিতির মুলোও ঝোলায়। সবচেয়ে বড় যুক্তি- জিহাদে গেলে একালে সম্মান, ওকালে বেহেস্ত নিশ্চিত। এ পর্যন্ত কর্মীরা সমন্বয়কারীর অধীনেই থাকে। কর্মীদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দু-তিনটি ভাগ হয়। শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য যাদের ভালো তাদেরকে সামরিক বিভাগে পাঠানো হয়। এ বিভাগকে তারা ক্রীড়া বিভাগ বলে। এই ক্রীড়া বিভাগের প্রধান সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলা ভাই। ক্রীড়া বিভাগের সদস্য বড়জোর ৫০ জন হবে। এ বিভাগের সদস্য অধিকাংশ আফগানিস্তান, প্যালেস্টাইন, লিবিয়া ফেরত। এদের সরাসরি যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা আছে। এ ছাড়া কিছু সেনা সদস্য ও ক্রীড়াবিদ আছে। বিস্ময়কর ব্যাপার, জঙ্গিদের ক্রীড়া বিভাগে ৮ (সম্ভাব্য) জন মেজর, ৫ (সম্ভাব্য) জন ক্যাপ্টেন আছে। এমনকি একজন মুক্তিযোদ্ধাও আছে। এদের কেউ ধরা পড়েনি।

জঙ্গি ক্যাডারদের আরো কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। বোমা তৈরির জন্য কিছু ক্যাডার বাছাই করা হয়। যতদূর জানা যায়, ভাড়া করা লোক দিয়েই বেশির ভাগ বোমা বানায়। অর্থ সংগ্রহ, লিফলেট লেখা, প্রচারপত্র বিলি, হুমকি দিয়ে চিঠি লেখা প্রভৃতি কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ থাকে। ১৭ আগস্ট যে লিফলেট (বাংলা ও আরবি) পাওয়া গিয়েছিল তা ১০-১২ জনের একটা গ্রুপ করেছিল বলে জানা যায়। এই গ্রুপের সদস্যরা উচ্চশিক্ষিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবুজ গ্রুপের একজন শিক্ষক ওই গ্রুপের প্রধান বলে গোয়েন্দারা সন্দেহ করছে।

অর্থের যোগান মধ্যপ্রাচ্যসহ বেশ কয়েকটি দেশ থেকে এলেও জঙ্গিরা নিজেরাও নিয়মিত চাঁদা তোলে। জঙ্গিদের ভাষায় 'উশর'। এক হিসেবে দেখা যায় বাগমারায় বাংলা ভাই ২০-২২ দিনে ৮০ হাজার টাকা উশর তুলেছিল।

জঙ্গি কর্মকান্ডে সারা দেশের মানুষ যখন বিপর্যস্ত, ঠিক তখন একশ্রেণীর মানুষের সুবিধা হচ্ছে। এই গ্রুপকে সুবিধাভোগী বলা যায়। সুবিধাভোগীরা হলো স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট। ব্যক্তিগতভাবে যারা লাভবান হচ্ছে তাদের মধ্যে আসাদুল হক গালিবের কথা বলা যায়। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েও কোটি কোটি টাকার মালিক। বাংলাদেশের ইতিহাসে এত ধনী শিক্ষক আর আছে কি না সন্দেহ। আরেকটি উদাহরণ ইসলামী ফাউন্ডেশনের সাবেক কর্মকর্তা মাওলানা মাসউদ। মাত্র ৪০০ টাকা দিয়ে অনুবাদক হিসেবে কর্ম শেষ করলেও চাকরি শেষে অগাধ টাকার মালিক হয়েছে। বিষয়গুলো যেভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন,

'জঙ্গিদের ধরা আর ছাড়া তো ওই উপরে বসা নেতা-নেত্রীর অঙ্গুলি হেলনের ওপর নির্ভর করে'

ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ
সিনিয়র আইনজীবী, সুপ্রিম কোর্ট

সাপ্তাহিক ২০০০ : জঙ্গি দমনে সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে তা পর্যাপ্ত কি না?

রোকনউদ্দিন মাহমুদ : সরকারি দলের লোকেরাই বলছে, জঙ্গি দমনে প্রথম দিকে তারা সিরিয়াস ছিল না। যার ফলে অবস্থাটা এমন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। এ স্বীকারোক্তি রাজশাহীর মেয়র মিনুর। শুধু মিনুই নন, বিএনপির অন্যতম সাংসদ আবু হেনাও একই রকম কথা বলেছেন। এ কথা থেকেই প্রমাণ হয়, জঙ্গি দমনে সরকারের আন্তরিকতার অভাব আছে। ধারণাভিত্তিক বা মতামতভিত্তিক কথা এটা নয় যে, সরকার আজ জঙ্গি দমনে তৎপরতা দেখালেও বাস্তবে তেমন কিছু করছে। তাই জঙ্গি দমনে যে ব্যবস্থা নিচ্ছে তা পর্যাপ্ত নয়।

২০০০ : জঙ্গিদের পুলিশ ধরছে কিন্তু কীভাবে যেন আবার তারা খালাস পেয়ে যাচ্ছে। আইনের দৃষ্টিতে এই ব্যাপারটা যদি বলতেন...

রোকনউদ্দিন : ছাড়া পাচ্ছে না, ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। জঙ্গি-ঘনিষ্ঠ এ সরকার জঙ্গিদের ধরে রাখে কী করে! আমার অভিজ্ঞতায় যা দেখছি, দুর্বল এজাহার, দায়সারা গোছের তদন্ত রিপোর্ট, সাক্ষীসাবুদের অভাবেই জঙ্গিরা একের পর এক অঘটন ঘটিয়েও পার পেয়ে যাচ্ছে। মূল কথা, সরকার যেমন চায়, প্রশাসন তেমনই চলে। জঙ্গিদের ধরা আর ছাড়া তো ওই উপরে বসা নেতা-নেত্রীর অঙ্গুলি হেলনের ওপর নির্ভর করে।

২০০০ : ১৭ আগস্টের পর সরকার বেশ কিছু জঙ্গি ধরেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছে।

রোকনউদ্দিন : হ্যাঁ, চার্জশিট দিচ্ছে।

২০০০ : আপনি কোনো চার্জশিট দেখেছেন?

রোকনউদ্দিন : না, দেখিনি।

২০০০ : চার্জশিটে কোনো ফাঁকফোঁকর থেকে যাচ্ছে কি না?

রোকনউদ্দিন : ফাঁকফোঁকর চার্জশিটে আছে। আমাদের গোয়েন্দারা তদন্ত না করে অনেকটা জ্যোতিষীর মতো অনুমান করে রিপোর্ট দেয়। সঙ্গত কারণেই তাদের দেয়া যত প্রকার অভিযোগপত্র দাখিল হয় তার সবই অনুমাননির্ভর, সত্যবর্জিত।

২০০০ : আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে জঙ্গি দমন করতে পারবে কি?

রোকনউদ্দিন : আইনের শাসন বাস্তবায়ন থাকলে কোনো অন্যায় টেকে না। আওয়ামী লীগ যদি আইনের শাসন কায়েম করে তাহলে জঙ্গি কেন; সন্ত্রাস, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিসহ যত সমস্যা আছে সব দূর হবে। আপনি আমাকে এরকম প্রশ্ন করতে পারেন, সরকার অস্ত্র উদ্ধারের নামে ক্রসফায়ারে লোক মারছে। জঙ্গি দমনে কেন সরকার তা করছে না। জঙ্গিরা তো বোমা মারছে, বোমা উদ্ধারের নামে এদেরও ক্রসফায়ারে নিতে পারতো।

যেভাবে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন তার কিছুই হচ্ছে না।

জয়েন্ট ইন্টারগেশন সেল ১৭ আগস্ট সিরিজ বোমা হামলার পর জঙ্গিদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে যে রিপোর্ট জমা দেয় তাতে বলেছে, 'জঙ্গিদের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক কানেকশনের কোনো তথ্য বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি?'

এটা কেন বলা হয়েছে? সরকারকে সন্তুষ্ট করার জন্য নাকি অন্য কিছু? অথচ দেশীয় জঙ্গি সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদিনের কানেকশন বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত। বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামিক ওয়েবসাইটে তাদের কর্মকান্ডের খবর প্রকাশিত হয়। 'জিহাদ আনস্পুন ডট কম' নামে একটি ইসলামিক ওয়েবসাইটে জেএমবির ঝালকাঠিতে বোমা হামলার খবর প্রকাশিত হয়।

খবরে বলা হয়, দেশে ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী শরিয়া মানা হয় না। কিছু পাপিষ্ঠ লোকের তৈরি সংবিধান আল্লাহর একজন দাস হিসেবে মেনে নিতে পারে না। মানুষের তৈরি আইন আল্লাহর আইনকে চ্যালেঞ্জ করছে। আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং তাঁর কাছে নতি স্বীকার করে বাংলাদেশে জামাআতুল মুজাহিদিন দেশের মানুষের তৈরি আইনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এতে বর্তমান পদ্ধতি থেকে সরে আসার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সতর্ক করে দেয়া হয়। একই সঙ্গে বাংলাদেশের সংবিধান আল্লাহর আইন ও সহি হাদিসের পরিপন্থী হওয়ায় তা বাদ দিয়ে আল্লাহর আইন প্রবর্তনের দাবি জানানো হয়। এই বিবৃতি ছাড়াও আন্তর্জাতিক কানেকশনের অনেক আলামতই গোয়েন্দাদের হাতে আছে।

দিনের আলোর মতো সত্য, জঙ্গিদের যে অর্থ আসে তার প্রায় পুরোটাই দেশের বাইরে থেকে আসে। বিশেষ করে কুয়েত থেকে আসে। সিরিজ বোমা হামলার পর অভিযোগ উঠেছিল কুয়েতি এনজিও 'রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি'সহ কয়েকটি এনজিও অর্থায়ন করছে। গোয়েন্দারা সৌদি আরব, কুয়েত, আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন মুসলিম দেশের এনজিওগুলোর আয়-ব্যয় সম্পর্কে তদন্ত চালিয়েছে। বেশ কিছু তথ্যও পেয়েছিল। ১৭ আগস্টের পরই শুধু নয়, এর আগে ২০০৩ সালে একটি গোয়েন্দা সংস্থা এসব এনজিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। বিস্ময়করভাবে সরকার অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখেনি। এমনকি এনজিও ব্যুরোও দেখেনি। জানা যায়, এনজিও ব্যুরো এনজিওগুলোর পক্ষ থেকে জমা দেয়া প্রকল্প আদৌ বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তাও পরীক্ষা করে না। কাগজে-কলমে প্রকল্প পরীক্ষার নামে যা লেখা তা নিতান্তই টেবিলে বসে কাজ। আয়-ব্যয়ের হিসাবে যা করে তা সত্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

এপর্যন্ত যত জঙ্গি ধরা পড়েছে তাদের একটা বড় অংশই জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোটের নেতা-কর্মী। উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনুসন্ধানে জানা গেছে, জামাতুল মুজাহিদিনের শীর্ষ নেতারাও এক সময় জামায়াত ও আমিনীর দলের সদস্য ছিল।

জানা গেছে, কওমি মাদ্রাসার ছাত্র ও আহলে হাদিস যুব সংঘের পাশাপাশি জামায়াত-শিবিরের মাঝারি পর্যায়ের নেতা-ক্যাডারের ওপর ভর করে জঙ্গি সংগঠনটি দ্রুত প্রসার লাভ করে।

গত ১৭ আগস্ট বোমা হামলায় জড়িত অভিযোগে হবিগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করেছে মুহম্মদ শামিমকে। শামিমের কথার ওপর ভিত্তি করেই ঢাকার বাসাবো থেকে জঙ্গি নেতা ইয়াসিরসহ বেশ ক'জন জঙ্গি গ্রেপ্তার হয়। এই শামিম এক সময় জামায়াতে ইসলামের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথী (মধ্যস্তরের ক্যাডার) ছিলো।

শামিমের বাবা মাওলানা সাইদুর জামায়াতের সক্রিয় কর্মী। সে এক সময় হবিগঞ্জ জেলা আমির ছিলো।

সিরিজ বোমা হামলার ঠিক এক মাসের মাথায় তুফান ও শহিদুল্লাহ নামে দু'জন ধরা পড়ল। ৪ কার্টন বোমা তৈরির সরঞ্জামসহ আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায়। শহিদুল্লাহ আগে শিবির করত। তার বাবা নাছির উদ্দিন আহমেদ জামায়াতের নেতা। বড় ভাই ওবায়দুল্লাহ চাঁপাইনবাবগঞ্জের জামায়াত শাখার অর্থ সম্পাদক।

গত ১১ নবেম্বর শুক্রবার রাত ২টার দিকে গাবতলী উপজেলার নারুয়ামালা সেতুর পাশে দুটি বোমা বিস্ফোরণের পর পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নজরুল ইসলাম (৩০) নামে এক জঙ্গিকে আটক করে। জঙ্গিকে ধরে থানায় আনতে না আনতেই জেলার আমিরপ্রাপ্ত জামায়াত নেতা থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্র জানায়, নজরুল ইসলাম জামায়াতের নেতা। গ্রেপ্তার হওয়া বাংলা ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী গাবতলী লাঠিগঞ্জ কলেজের প্রভাষক আবদুল হক গাবতলী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ছিলো।

২০০৩ সালে ক্ষেতলাল উপজেলার পুলিশের সঙ্গে জঙ্গিদের সংঘর্ষ হয়। সে সময় পুলিশের বেশ কিছু অস্ত্রও খোয়া যায়। পরে পুলিশ ৪২ জন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে। এই ৪২ জনের মধ্যে ৩৬ জনই স্থানীয় জামায়াত-শিবিরের সদস্য ছিল। জঙ্গিদের যে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়, সেই বাড়ির মালিক জঙ্গি নেতা মন্তাজুর রহমান স্থানীয় জামায়াত নেতা ছিল।

ইসলামী ঐক্যজোটের অনেকগুলো খন্ডাংশ থাকলেও ফজলুল হক আমিনীর অনুসারীরা অপেক্ষাকৃত বেশি জামাআতুল মুজাহিদিনের সদস্য হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে, সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এবং জামায়াতুল মুজাহিদিনের তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করে জানা যায়, ইসলামী ঐক্যজোটের একটা বড় অংশ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত।

সরকারের কাছেও এসব তথ্য কমবেশি আছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সে রকমই মন্তব্য করছে। তার পরও জাতিকে হতবাক করে দিয়ে সরকার জোটের শরিক জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রেখেছে। গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক দেশে ৫২টি ইসলামী দল ও গ্রুপের তালিকা তৈরি করলেও জামায়াত এবং আমিনীদের তালিকায় রাখা হয়নি। তালিকায় রাখা হয়নি মাওলানা মহিউদ্দিনের মদীনা ভবনকে। সরকার জামায়াতকে হাতছাড়া করতে ভয় পায়। সরকারের মধ্যে একটা অংশ জঙ্গিদের তৎপরতা কিংবা জামায়াত-আমিনীদের সংশ্লিষ্টতার কথা আড়াল করে আসছে।

কাকের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। কোনো খাবার লুকিয়ে রাখার জন্য সে চোখ বুজে কোথাও লুকিয়ে রাখে। ভাবে, নিজে না দেখলে অন্য কেউ দেখবে না। সরকারের বর্তমান ভূমিকা এখন কাকের মতোই।

অনেক ত্যাগ শিকার করে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে খালেদা জিয়া আজ প্রধানমন্ত্রী। সেই জনগণের কথা কি মনে আছে খালেদা জিয়ার? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি জানেন তার চারপাশের মানুষরূপী এরা কারা? মহিউদ্দিন, আজিজুল, আমিনীদের উদ্দেশ্য কী? আলতাফ চৌধুরী, সাকাচৌদের দাবার ঘুঁটি হিসেবে কেন ব্যবহৃত হচ্ছেন খালেদা জিয়া? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি কি এটা জেনে, বুঝে করছেন?

বিষাক্ত সাপ যে আপনাকে জাপটে ধরেছে, সেটা কি আপনি বুঝতে পারছেন না? 'জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি'- নাকি আপনার ক্ষেত্রে এটাই সত্যি?

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বাঙালি জাতি পরাজিত হতে চায় না। রাষ্ট্র হিসেবে ব্যর্থ বা অকার্যকর হয়ে যেতে পারে না বাংলাদেশ। আপনাকে বিশ্বাস করে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে জনগণ। আপনি জনগণের সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখছেন না। বিদেশীরা বাংলাদেশকে নিয়ে মন্তব্য করেছিল- 'পরবর্তী আফগানিস্তান'।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি কেন সেটা প্রমাণ করার সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছেন? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, কেন বাংলাদেশের পরিণতি হচ্ছে আফগানিস্তান?

আপনাকে ভোট দিয়ে হয়তো দেশের মানুষ অপরাধ করে ফেলেছে। অনেক হয়েছে, এবার জনগণকে মাফ করে দিন!

একবার বোঝার চেষ্টা অন্তত করুন!!